নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

সাহেবের নাম এন. এ. ফারমুর। নীলগঞ্জের নীল কুঠিয়াল সাহেবের বর্তমান বংশধর। আমি বাল্যকাল হইতেই সাহেবকে চিনি। যখন স্কুলে পড়ি, সাহেবদের কুঠিতে একবার বেড়াইতে যাই। ফারমুর সাহেবকে এদেশের লোক ফালমন্ সাহেব বলিয়া ডাকে। আমার বাল্যকালে ফালমন্ সাহেবের বয়স ছিল কত ? পঞ্চাশ হইবে মনে হয়। সাহেবদের কুঠিতে যাইয়া দেখিতাম সাহেব দুধ দোয়াইতেছেন। অনেকগুলি বড় বড় গাই ছিল কুঠিতে, বিশ ত্রিশ সের দুধ হইত। নৌকা করিয়া প্রতিদিন ওই দুধ মহকুমার শহরে প্রেরিত হইত। আমাকে বড় ভালোবাসিতেন। আমাকে দেখিয়া বলিতেন—সকাল বেলাতেই এসে জুটলে। খাবা কিছু?

—খাবো।

—কি খাবা? দুধ?

—যা দেবেন।

—ও মতি, ছেলেটিকে গুড় দিয়ে মুড়ি দাও আর দু'উড়কি দুধ দাও—আমি এই মাত্তর খেয়ে আলাম—বোসো খোকা, বোসো।।

নীলকুঠির আমলে ফালমন্ সাহেবের বাবা লালম্ন (লালমুর) সাহেবের অসীম প্রতিপত্তি ছিল এদেশে। নীল চাষ উঠিয়া যাইবার পরে বিস্তৃত জমিদারির মালিক হইয়া এ দেশেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। ক্রমে জমিদারিও চলিয়া যায় অনেক, লালমন্ সাহেবও মারা যান। ফালমন্ বিস্তৃত আউশ ও আমন ধানের জমি চাষ করিতে থাকেন, বড় বড় গরু পুষিতেন, সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগি, ছাগল ও ভেড়া। সাহেবের কুঠিতে সারি সারি ধানের গোলা ছিল বিশ-ত্রিশটা। জমিদারিও ছিল, কুঠির পুবদিকের বড় হলদে ঘরে (যার সামনে বেগুনি প্যাটনফুলের প্রকাণ্ড গাছ, কি ফুল জানি না, আমরা বলিতাম 'প্যাটেন' ফুল) কুঠিয়াল সাহেবের নায়েব ষড়ানন বক্সি কাছারি করিতেন, এবং প্রজাপত্র ঠেঙাইতেন। লালমন্ সাহেব কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন বলিতে পারিব না, তবে তাহার বৈঠকখানায় একখানা বড় ছবির তলায় লেখা ছিল "T. Farmour of Bournemouth, England." ফালমনের জন্ম নীলগঞ্জেই। তাঁহাদের সকলেই যশোর জেলার পাড়াগাঁয়ের কৃষক শ্রেণির ভাষায় কথা বলিতেন।

—কি পড়ো?

—মাইনর, সেকেন্ ক্লাসে।

—ইউ. পি. পাশ করেচ?

—হ্যাঁ।

—বিত্তি পেয়েছিলে?

—না।

—আমার ইস্কুলে পড়ো?

—আপনার ইস্কুলে না। জেলাবোর্ডের স্কুলে, চেতলমারির হাটতলায়।

—ও বুঝিচি। তবে তোমার বাড়ি এখানে না?

—আজ্ঞে না। আমার পিসির বাড়ি এখানে।

—কেডা তোমার পিসে?

—ভূষণচন্দ্র মজুমদার।

—আরে মজুমদার মহাশয়ের বাড়ি এসেচ তুমি? বেশ বেশ, নাম কি?

—শ্রীরতনলাল চক্রবর্তী।

—পিতার নাম?

—শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

—তুমি মাখনলাল মাস্টারের ছেলে? চেতলমারির ইস্কুলির?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাই বলো। মাখন মাস্টার তো আমাদের বন্ধু লোক। বেশ, বসো, দুধ দিয়ে মুড়ির ফলার করে খাও।

ফালমন্ সাহেবের সঙ্গে এইভাবেই আলাপ শুরু। তা বাদে মাঝে মাঝে সাহেবকে চেতলমারির খড়ের মাঠে আমীনকে সঙ্গে লইয়া জমি মাপিতে দেখিয়াছি। কতদিন নৌকায় লোকের সাহায্যে পটল, কুমড়া বোঝাই করিতে দেখিয়াছি। লম্বা একহারা সাহেবি চেহারা। ভুঁড়ি একদম নাই, গায়ে এক আউন্স চর্বি নাই কোথাও। গোঁফজোড়াটা বড্ড লম্বা, দৃঢ় চোয়াল—সবই ঠিক সাহেবি ধরনের। কিন্তু পোশাকটা সব সময় সাহেবের মতো নয়, কখনো ধুতি, কখনো কোটপ্যান্টের উপর মাথায় তালপাতার টোকা। শেষোক্ত বেশটা দেখা যাইত যখন ফালমন্ মাঠে চাষবাসের তদারক করিতেন। কৃষাণ ছিল সংখ্যায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, লাঙল গরু চল্লিশখানা, আট-দশখানা গরুর গাড়ি। এত বড় ফলাও চাষ সাধারণ কোনো বাঙালি গৃহস্থ চাষি কল্পনাও করিতে পারে না। তালপাতার টোকা মাথায় কৃষকদের কাজকর্ম দেখাশোনা করিতেন বটে, কিন্তু হুঁকোয় তামাক খাইতে কখনো দেখি নাই—পাইপ সর্বদা মুখে লাগিয়াই থাকিত। কৃষাণদের বলিতেন—বাবলাতলার জমিগুলোতে দোয়ার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার চাষ) দেবা কবে ও সোনাই মণ্ডল? তা দ্যাও, আর দেরি করবা না। রস টেনে গেলি ঘাস বেঁধে যাবে আনে, তখন লাঙ্গল বেশি লাগবে। এখনো ভুঁইতে রস আছে।

সোনাই মণ্ডল হয়তো বলিল—বাবলাতলার উঁইতে পানি আর কনে সাহেব? কে বল্লে আপনারে ?

—নেই? কাল সাঁজের বেলা আমি আর প্যাট (সাহেবের শালা, এখানেই বরাবর থাকিত দেখিতাম, চাষবাসের কাজ দেখে) যাইনি বুঝি? ঝা পানি আছে তাতে কাজ চলে যাবে আনে।

—ছোলা কাটতি হবে এবার?

—এখনো দানা পুরুষ্ট হয়নি, আর চার-পাঁচটা রোদ খাক। সময় হলি ব-অ-ল-বো—

এই সময় নদীপপুরের গোপেশ্বর বৈরাগীকে মাঠের পাশের পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া মাথার টোকাটা কপালের উপর দুই আঙুল দিয়া একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া বলিলেন—ও গোপেশ্বর—শোনো—ও গোপেশ্বর—

গোপেশ্বর আসিয়া বলিল—সেলাম সায়েব—

সাহেবের দোর্দণ্ডপ্রতাপ এ অঞ্চলে, কারণ অধিকাংশই তাহার প্রজা।

—যাচ্ছ কনে?

—যাবো একবার পানচিতে। মেয়ের খবর পাইনি অনেক দিন। জামাইডা কেমন আছে দেখে আসি, পেটজোড়া পিলে তার। গত অঘ্রাণ মাসে যায়-যায় হইছিল—

—ম্যালেরিয়া?

—তা আমরা কি বুঝি? তাই হবে।

—বেশ। একটা কৃষ্ট বিষয় গান করে শুনিয়ে যাও দিকি?

—কৃষ্ট বিষয়?

—কিংবা শ্যামা বিষয়। না, তুমি বোষ্টম, টুম আবার বুঝি শ্যামা বিষয় গাইবা না। ঝা মন চায় একখানা শোনাও। বড্ড রোদ পড়চে, শরীলির কষ্ট হয়েচে বড্ড। বোসো, এই পিটুলিতলার ছাওয়াপানে।

গোপেশ্বর গান গাহিতে বসিয়া দুবার কাশিল, সাহেবের দিকে লাজুক দৃষ্টিতে দু'একবার চাহিয়া পরে গান আরম্ভ করিল—

কোন্‌টি তোমার আসল রূপ শুধাই তোমারে—

ফালমন্‌ সাহেব হাতে তালি দিতে দিতে বলিলেন—বাঃ বাঃ—বেশ গলা—দাশুরায় না নীলকণ্ঠ?

—নীলকণ্ঠ।

—দাশুরায় একখানা হোক না?

সাহেবের আদেশ অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই এ অঞ্চলে, সুতরাং গোপেশ্বরকে আর একখানা গান গাহিতেই হইল।

ভয়ে আকুল বসুদেব

দেখে অকূল যমুনা।

কূলে বসে দুনয়নে বারি ঝরে

কোলে অকূলের কাণ্ডারী তাও জানে না।

একবার ভাবি যদি বর্তমান কংসের পদে

দৈবে দয়া যদি হোত পাষাণ হৃদে—

তা হয় না আর

গেল একূল ওকূল দুকূল

কুলের তিলক রাখতে কূল পেলেম না।

ভয়ে আকুল বসুদেব ।

দেখে অকূল যমুনা

ফালমন্‌ সাহেব চক্ষু মুদিয়া পাইপ টানিতে টানিতে গান শুনিতেছিলেন। আবার গোপেশ্বরের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ—দাশুরায়ের গানের কাছে আর সবকিছু লাগে না। কি রগম—কি ওরে বলে গোপেশ্বর?

—অনুপ্রাস?

—ওই যা বল্লে। ভারি চমৎকার, লাগতিই হবে যে! দাশুরায় হুঁ—

—আজ উঠি সায়েব।

—আচ্ছা এসো—

ফালমন্‌ সাহেবের কাছারিঘরে—রাম শ্যামকে মারিয়াছে, শ্যামের গরু যদুর পটলের ক্ষেত নষ্ট করিয়াছে—এই সব গ্রাম্য মামলার বিচার হইত। বিচার সাধারণত করিত নায়েব ষড়ানন বক্সি, গুরুতর মোকদর্মায় ফালমন্‌ সাহেব নিজে বিচারাসনে বসিতেন।

আমি দেখিয়াছিলাম যেদিন গুড়ে জেলের ভাই-বৌ রেমো ধোপার ছেলে অতুলের সঙ্গে সোজা চম্পট দেওয়ার পরে আড়ংঘাটা স্টেশনে ধরা পড়িয়া পুনরায় গ্রামে আনীত হইল, সেদিন ফালমন্‌ সাহেবের বিচার। গ্রামে হইচই কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ দু'দশ বছরে এই ধরনের ব্যাপার কেহ এ অঞ্চলে দেখে নাই, শোনেও নাই।

ফালমন্‌ সাহেব অতুলকে কড়াসুরে প্রশ্ন করিলেন— জেলে-বৌয়ের বয়সটা কত?

অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—তা জানিনে সাহেব।

—তোমার চেয়ে বড় না ছোট?

—আমার চেয়ে বড়।

—তোমার বয়েস কত?

—আজ্ঞে, এই তেইশ।

রেমো ধোপার দিকে চাহিয়া সাহেব বলিলেন—এই রেমো, বয়েস ঠিক বলচে তো?

রোমো বলিল—হাঁ, সাহেব।

—আর জেলে-বৌয়ের বয়স কত?

গুড়ে জেলে বলিল—আজ্ঞে, বত্রিশ।

—বত্রিশ?

—আজ্ঞে।

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অতুলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোর বড় দিদির বয়সি যে রে হারামজাদা তোর লঘু-গুরু জ্ঞান নেই? মারো দশ জুতো সকলের সামনে—আর পঞ্চাশ টাকা জরিমানা, যাও—

ব্যাস, বিচার শেষ।

আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ বা ওকালতি খাটিবে না। The great Khan has spoken-মিটিয়া গেল।

সেকালের নীলকুঠির অটোক্র্যাট ভূম্যধিকারীর রক্ত ছিল ফালমন্ সাহেবের গায়ে, প্রজা পীড়ন ও শোষণে তিনি তেমনি পটু, তবে যুগপ্রভাবে নখ-দন্ত অপেক্ষাকৃত ভোঁতা—এইমাত্র।

সেবার মস্ত বড় দাঙ্গা বাধিল বাগদি ও জেলে প্রজাদের মাতলার বিলের দখল লইয়া। মাতলার বিল বরাবর বাগদি প্রজাদের কাজে বন্দোবস্ত করা ছিল রানি রাসমণি এস্টেটের স্বরূপনগর কাছারি থেকে। কখনো এক পয়সা খাজনা আদায় হইত না। মামলা-মোকদর্মা করিয়াও কিছু হয় না—তখন রানি-এস্টেটের নায়েব ভৈরব চক্রবর্তী মাতলার বিল দশ বৎসরের জন্য ইজারা দিলেন ফালমন্ সাহেবকে। সেলামি এক পয়সাও নয়, কেবল শালিয়ানা আড়াইশো টাকা খাজনা। কারণ দুর্ধর্ষ জেলে ও বাগদি প্রজাদের কাছ থেকে বিলের দখল পাওয়াই ছিল সমস্যা—সাহেবের দ্বারা সে সমস্যা পূরণ হইবে, ভৈরব চক্রবর্তীর এ আশা ছিল এবং সে আশা যে নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়—বিল ইজারা দেওয়ার একপক্ষ কালের মধ্যেই পদ্মফোটা মাতলা বিলের রক্ত-রঞ্জিত জল তাহার প্রমাণ দিল। প্রকাশ ফালমন্ সাহেব স্বয়ং টোকা মাথায় দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া দাঙ্গা পরিচালনা করিয়াছিলেন। যদিও পুলিশ রিপোর্টে পরে প্রকাশ হইল, দাঙ্গার সময় ফালমন্ সাহেব তাঁর বড় মেয়ে মার্জোরির টনসিল অস্ত্র করিবার জন্যে তাহাকে লইয়া কৃষ্ণনগর মিশন হাসপাতালে যান।

মামলাবাজ ও ধরনের আর একটি লোক সারা জেলা খুঁজিলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

প্রায়ই মহকুমায় মামলা পড়িত।

সাহেবের চারদাঁড়ের ডিঙি সাতটার সময় ছাড়িত কুঠিঘাট থেকে। ছইয়ের মধ্যে ফালমন্ সাহেব ও তাঁর খাওয়ার জন্য ফলের ঝুড়ি, জলের কুঁজো, দুধের বোতল, নায়েব ষড়ানন বাবু ও তাঁর বিছানাপত্র, দুজন মাঝি (তার মধ্যে একজনের নাম গোপাল পাইক, জাতে বাগদি, খুব ভালো গান গাহিতে পারে)—এই লইয়া তীরবেগে নৌকা ছুটিত দশ মাইল দূরবর্তী মহকুমার শহরের দিকে। হু হু করিয়া মুখোড় বাতাস বহিত। গাঙে সাহেবের প্রিয় অনুচর গোপাল পাইক প্রভুর ইঙ্গিতে নৌকার গলুইয়ের কাছ থেকে ছইয়ের কাছে সরিয়া আসিত। সাহেব বলিতেন—একটা কৃষ্ণ-বিষয় কিংবা শ্যামা-বিষয় গাও গোপাল—

গোপাল অমনি ধরিত—

নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনী জড়িত জটা সুশোভিনী

নীল নয়নী জিনি ত্রিনয়নী কিবা শোভে নিশানাথ নিভাননী—

তারপর গাহিত—

কি কর কি কর শ্যাম নটবর, ছাড় যাই নিজ কাজে—

গোপাল পাইক যাত্রাদলে অল্প বয়সে গাহিত, সাহেবের সঙ্গীতপ্রিয়তার কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার আশায় একদিন সে নীলগঞ্জের কুঠিতে গাহিতে আসে—গান শুনিয়া সাহেবের বড় ভালো লাগিল এবং সেই হইতে গোপাল সাহেবের এস্টেটের চাকুরিতে বহাল হইয়া গেল।

এক পয়সা খাজনা বাকি থাকিলেও যেমন সাহেবের এস্টেট হইতে নালিশ হইত, আবার ধরিয়া পড়িলে ক্ষমা করিতেও ফালমন্ সাহেব ছিলেন বিশেষ পটু। কতবার এরকম হইয়াছে। দুর্বুদ্ধি প্রজা ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কিংবা উকিল-মোক্তারদের উৎসাহে নীলগঞ্জ এস্টেটের বিরুদ্ধে মামলা লড়িয়াছে। একবার ফৌজদারি, তারপর স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী দেওয়ানী, মহকুমা হইতে সাব-জজকোট, সেখান হইতে আবার পুনর্বিচারের জন্য মহকুমার মুনসেফকোর্ট—এই করিতে করিতে প্রজা এস্টেটকে হয়রান করিয়া এবং নিজেও সর্বস্বান্ত হইয়া যখন জ্ঞানচক্ষু লাভ করিল, তখন হিতৈষী বন্ধুদের পরামর্শে কোর্টের বটতলাতেই একেবারে ফালমন্ সাহেবের পা জড়াইয়া উপুড় হইয়া পড়িল পায়ে।

—আরে কি কি, কে?

—আজ্ঞে আমি মুকুন্দ বিশ্বেস।

সাহেব পায়ের ঝটকা মারিয়া বলিলেন—বেরো হারামজাদা—বেরো—বেরো—

ফালমন্ হিন্দি কথাই জানিতেন না, খাঁটি বাংলা ইডিয়মযুক্ত ভাষা ব্যবহার করিতেন এবং সে শুধু এইজন্য যে নীলগঞ্জের কুঠিই তাঁহার জন্মস্থান, এই গ্রাম্য আম-জাম-নিকুঞ্জ ছায়ার শ্যামলতায় ও কৃষকদের সাহচর্যে তিনি আবাল্যে লালিত পালিত ও বর্ধিত। ডরসেটশায়ারের ইংরাজরক্ত ধমনিতে থাকিলেও মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালি, ঊনবিংশ শতাব্দীর নিশ্চিন্ত শান্তি ও আলস্যের মধ্যে যাহার যৌবন কাটিয়াছে, সেই সচ্ছল বাঙালি জমিদার। মুকুন্দ বিশ্বাস ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। ব্যাপার দেখিতে লোক ছুটিয়া ভিড় বাধাইল। সকলেই ভাবিল সাহেব কি অত্যাচারী। গরিব প্রজাকে কি করিয়া পীড়ন করিতেছে দ্যাখো! একেবারে এইভাবেই সর্বস্বান্ত হয়? ছিঃ

কেহ বুঝিল না কিরূপ তেঁদড় ও দুঁদে প্রজা মুকুন্দ কলু।

—কি চাই? কি?

—সায়েব মা-বাপ—ধরম বাপ—মোরে বাঁচাও ধরম বাপ—

—কেমন? মোকদ্দমা করবিনে? কর ছানি—শোনছেন ও হরিশবাবু, শোনেন ইদিকি।

চোগা-চাপকান পরনে বড় উকিল হরিশচন্দ্র গাঙ্গুলী ঘটনাস্থলের কিছু দূর দিয়া যাইতেছিলেন। সাহেবের আহ্বানে নিকটে আসিতে আসিতে বলিলেন—গুড মর্নিং মি. ফারমুর, বলি ব্যাপার কি?

—আরে দ্যাখেন না কাণ্ডখানা। চেনেন না মুকুন্দ বিশ্বাসকে? পাঁচপোতার মুকুন্দ বিশ্বাস। বদমায়েশের নাজির, ওর বদমায়েশি দেখতে দেখতে মাথার চুল আমি পাকিয়ে ফ্যাললাম হরিশবাবু, ওরে আর আমি চিনিনে? শুনুন তবে—আরে নায়েব মশায়, বলুন দিকি সব খুলে—

সব শুনিয়া হরিশবাবু মুকুন্দ কলুকে ধমক দিয়া কিঞ্চিৎ সদুপদেশ দিলেন। সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা! তাহার মতো ট্যানাপরা লোকের পক্ষে? যাক, যাহা হইবার হইয়াছে, সায়েব নিজগুণে এবারটি গরিবকে মাপ করিয়া দিন।

সাহেবকে হরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—আজ বুঝি ডিক্রির দিন?

—নিশ্চয়। ও এতদিন আমার সঙ্গে একটা কথা কইতো না। আজ একেবারে পায়ে ধরেছে।

ষড়ানন বক্সি বলিল—শুধু পায়ে ধরা নয়, একেবারে মড়াকান্না কেঁদে লোক জড়ো করে ফেলেছে—

সাহেব জনতার উদ্দেশ্যে বলিলেন—এই, যাও সব এখান থেকে। এখানে কি? চলে যাও সব—

হরিশবাবু উকিলও সেই সঙ্গে যোগ দিয়া কহিলেন—হ্যাঁ, তোমরা কেন এখানে বাপু? কাছারির সামনে ভিড় করো না—হাকিম চটবেন—যাও এখন—এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

হিসাব করিয়া ষড়ানন বক্সি সাহেবকে জানাইল, এই মামলায় এ পর্যন্ত সাতশো সাড়ে-সাতশো টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

সাহেব বলিলেন—আচ্ছা যা, মাপ করলাম। নায়েববাবু, মামলা মিটিয়ে নেবেন।

ষড়ানন বক্সি বলিল—খরচার টাকা?

—ওর সঙ্গে না হয় ষড় করি নেবেন। তবে বলে দিন, আবার কুঠিতে গিয়ে নাকে খত দিতি হবে ওকে—নইলে আমি ওকে ছাড়বো না। ও নাকে খত দিতে রাজি কিনা?

মুকুন্দ বিশ্বাস খুব রাজি। সে এখনি নাকে খত দিতে প্রস্তুত আছে। সাহেবের আশ্বাস পাইয়া সে চলিয়া গেল।

সেবার শীতকালের মাঝামাঝি মিসেস ফালমন্ লিভারের অসুখে ভুগিয়া কলিকাতার হাসপাতালে মারা গেলেন। দিন-সাতেক পরে নীলগঞ্জের চারিপাশের পাঁচ-ছয়খানি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদিগের কাছে তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করা হইল—মেমসাহেবের আত্মার মঙ্গলকামনায় যদি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা হয়, তাঁহারা খাইবেন কিনা। তখনকার দিনে এসব ধরনের খাওয়ায় সামাজিক কড়াকড়ি অনেক বেশি ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদের রাজি না হইয়া এক্ষেত্রে উপায় ছিল না। সাহেবকে চটাইতে কেহই রাজি নয়।

নীলগঞ্জের কাছারিঘরের সামনে তুঁততলায় দু'দিন ধরিয়া কালী ময়রা সন্দেশ, বোঁদে, পানতুয়া ভিয়ান করিল। কাছারিবাড়ির হলে ব্রাহ্মণ ভোজনের যে বিরাট ব্যবস্থা হইয়াছিল, ও অঞ্চলে সে রকম খাওয়ানো কখনো কেহ দেখে নাই।

ফালমন্ সাহেব কুঠির গেটে নিজে দাঁড়াইয়া প্রত্যেককে বলিতেছিলেন—পেট আপনাদের ভরেছে? কষ্ট দেলাম আপনাদের এনে, কিছু মনে করবেন না—

আমিও সে দলে ছিলাম, তখন স্কুলের বালক, ভূরিভোজন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলাম। দীর্ঘাকৃতি ফালমন্ সাহেবের সে বিনীত মুখভাব, সৌজন্যপূর্ণ সহৃদয় দৃষ্টি এখনো মনে আছে। মানবতার উদার গতিপথের পার্শ্বে অবস্থিত এই ছবিখানি আজিকার এই হিংসা দ্বেষ ও সাম্প্রতিক ধর্মমতের দ্বন্দ্বের দিনে বেশি করিয়া স্মরণে উদিত হয়।

বারোয়ারি যাত্রার আসরে ফালমন্ সাহেব সকলের সামনের চেয়ার পাতিয়া বসিতেন। যাত্রাগানের অমন ভক্ত দুটি দেখা যাইত না।

—ও বেয়ালাদার, একটা একালে গৎ ধরো বাবা–জুড়িদের এগিয়ে দাও—

সাহেবের ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে যাত্রাদলের গাইয়ে-বাজিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

আর কৃষ্ণ সাজিয়া আসিয়া গান ধরিলেই হইল, অমনি মেডেল ঘোষণা।

সাহেব দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিবেনই—এই যে ছোঁড়া কৃষ্ট সেজে এসে গানখানা করে গেল, ওরে আমি একটা রুপোর মেডেল দেবো। কথা শেষ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাসিমুখে চাহিয়া বলিতেন—হাততালি হাততালি—

অমনি চটপট করিয়া চতুর্দিকে হাততালি পড়িবে। নিজে সকলের আগে হাততালি দিবেন।

কোনো করুণ ভক্তিরসের ব্যাপার ঘটিলে সাহেব সকলের সঙ্গে 'হরিবোল' দিয়া উঠিবেন।

বারোয়ারিতে চাঁদা দিতে সাহেব যেমন মুক্তহস্ত, তেমনি রক্ষাকালীপূজা বা শীতলাপূজার অনুষ্ঠানে। তখনকার দিনে বারোয়ারি দুর্গাপূজা বা শ্যামাপূজার রেওয়াজ ছিল না।

মিসেস ফালমন্ মারা যাওয়ার পর নীলগঞ্জের কুঠির রাঙা 'প্যাটেন' ফুলের গাছ, নদীর ধারের অত বড় বাড়ি, লেবু ও আমের বাগান, পসার-প্রতিপত্তি, অর্থসম্পত্তি সব কিছু শ্রীহীন হইয়া পড়িল। বাড়ির এক নিম্নজাতীয়া দাসীর সঙ্গে সাহেবের নাম জড়িত হইয়া চারিদিকে প্রচার হইতে লাগিল। মার্জোরি ও ডোরা বিবাহ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সাহেবের যে ছেলে বিলাতে পড়িত, সে আর এদেশে আসিলই না। শোনা গেল, ইংল্যান্ডেই বিবাহ করিয়া সেখানেই সংসার পাতাইয়া সে ইংল্যান্ডের প্রজাবৃদ্ধির দিকে মন দিয়াছে।

এই সময় নীলগঞ্জের কুঠিতে এক ঘটনা ঘটিল।

বাহির হইতে কে একজন সাহেব আসিয়া কিছুদিন কুঠিতে রহিল। এ সময়ে প্যাটও কুঠি হইতে চলিয়া গিয়াছিল। নবাগত সাহেবের নাম মি. মুডি। এ অঞ্চলে তাহাকে "মুদি সায়েব" বলিত সবাই। মুদিসাহেব একটু অতিরিক্তমাত্রায় মদ খাইত।

একদিন কি ঘটিয়াছিল কেহ জানে না, গভীর রাত্রে মি. ফালমনের সঙ্গে মুদি সাহেবের বচসার শব্দ শোনা গেল। বাহির হইতে চাকরেবাকরে কিছু বুঝিল না, হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল, সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখে মুদি সাহেবের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ঘরের মেঝেতে লুটাইতেছে এবং ঘরের কোণে সেই নীচজাতীয়া দাসীটা দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

পুলিশ তদন্ত হইল। কিন্তু মি. ফালমনের কিছু হয় নাই, ব্যাপার নীলকুঠির শক্ত কম্পাউন্ডের বাহিরে এক পা-ও গড়ায় নাই।

এই ঘটনার পরেও ফালমন্ সাহেব অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। একাই থাকিতেন। পুত্র-কন্যা কখনো আসিত না। সাহেবের এক ভাই শোনা যায় ইংল্যান্ড হইতে কতবার তাঁহাকে সেখানে যাইতে লিখিয়াছিল, ফালমন্ সাহেব বলিতেন—এদেশেই জন্ম, এদেশ ভালোবাসি, যাবো কোথায়? যখন মরে যাবো ওই নিমতলায় কবর দিয়ো, বাবা আর মায়ের পাশে। এদেশেই জন্ম, এদেশেই মাটি মুড়ি দেবে।

ফালমন্ সাহেব এদেশেই মাটি মুড়ি দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্বে। নীলগঞ্জের কুঠি ভাঙিয়া-চুরিয়া জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। এখন সেখানে দিনমানেও বাঘ বুনো-শুয়োরের ভয়ে কেউ যায় না। কুঠির নিমতলায় ঘন কুঁচকাঁটায় দুর্ভেদ্য ঝোপের ছায়ায় খুঁজিলে ফালমন্ সাহেবের কবরের ভগ্নাবশেষ এখনো কৌতূহলী রাখাল বালকদের চোখে পড়ে। আলমপুর পরগণার বড় তরফের দে চৌধুরী জমিদারবাবুরা নীলগঞ্জের জমিদারি গভর্নমেন্টের নীলামে ক্রয় করিয়াছিলেন।